এই সংখ্যায় ভিতরের পাতায়
√ ডাঃ অমিতাভ নন্দীর সাক্ষাৎকার— বিষয় ম্যালেরিয়া।
√ যারা হারিয়ে যাচ্ছে।
√ পৃথিবীর ছাতা রক্ষার চেষ্টা।
√ সংখ্যায় কতমজা। √ কৌতুহল।
√ ম্যালেরিয়ার ওষুধ।

বিজ্ঞান অন্বেষক

✆ (033) 2585 8188/0172 (O)
Mobile : 9831178704
TAX CONSULTANT
Ajit Kumar Ghosh
● INCOME TAX ● SALES TAX
● PROFESSIONAL TAX ETC.
: Resi. Cum Off. :
20, Chandmari Road, P.O. Kanchrapara,
North 24 Pgs. (Near Sree Laxmi Cinema).

বর্ষ -১ | প্রথম সংখ্যা | জুলাই - আগস্ট / ২০০৩ | দাম ১টাকা

'ম্যালেরিয়া'

অতীতের আতঙ্ক, বর্তমানের শঙ্কা!

মানুষের রোগের ইতিহাসে ম্যালেরিয়া একটি প্রাচীন রোগ। পৃথিবীর অনেক দেশে এই রোগে প্রচুর মানুষ মারা যেত, অথর্ব হত প্রচুর। মানুষের ধারণা ছিল, খারাপ বাতাস বা জলাভূমি থেকে এইরোগ হয়। জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ জেনেছে ম্যালেরিয়ার আসল কারণ হল খালিচোখে দেখা যায় না এমন এককোষী প্রাণী। প্লাসমোডিয়াম গণের এই প্রাণীগুলো মানুষের রক্তের লোহিত কোষে বাসা বাঁধে এবং ওই কোষকে ধ্বংস করে। মানুষের দেহে জীবন চক্রের কিছু দশা কাটিয়ে এরা প্রবেশ করে মশার দেহে। মশার দেহে জীবন চক্রের কিছু দশা কাটায় তার পরে আবার মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

প্লাসমোডিয়াম গণের চারটি প্রজাতি মানুষের দেহে চার রকমের ম্যালেরিয়া সৃষ্টি করে। চার্লস লুই আলফানসে ল্যাভেরান প্রথম এদের চিহ্নিত করেন। মশা থেকে কিভাবে ম্যালেরিয়া ছড়ায় তা প্রথম জানান রোনাল্ড রস।

কিভাবে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ হয় :-

ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রের একটি দশা (দেখতে দুপ্রান্ত সরু সুতোর মতো যা স্পোরোজয়েট নামে পরিচিত) মশার লালাগ্রন্থিতে থাকে। এই মশা সুস্থ মানুষকে কামড়ালে স্পোরোজয়েটগুলি মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এই দশা রক্তবাহিত হয়ে মানুষের যকৃতের কোষে প্রবেশ করে এবং পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন বিভিন্ন প্রজাতির জীবাণুর ক্ষেত্রে ৬-৯ দিন ধরে ঘটে। পরিবর্তিত দশা (মেরোজয়েট) যকৃত কোষ থেকে বেরিয়ে রক্তের লোহিত কোষে প্রবেশ করে এবং তিন-চার দিনের মধ্যে ট্রোফোজয়েট, সাইজন্ট দশার মাধ্যমে পুনরায় বহু মেরোজয়েট সৃষ্টি করে। এই মেরোজয়েটগুলি লোহিত কোষকে নষ্ট করে রক্ত স্রোতে বেরিয়ে আসে ও আবার নতুন কোন লোহিত কোষকে আক্রমণ করে। এইভাবে অল্প সময়ে প্রচুর লোহিত কোষ নষ্ট হয়। কিছু মেরোজয়েট লোহিত কোষকে আক্রমণ না করে গ্যামেটোসাইট নামে দশায় বদলে যায়। রোগীকে মশা কামড়ালে এই গ্যামেটোসাইট দশা রক্তের সাথে মশার দেহে পৌঁছায়। পরে মশার দেহে স্পোরোজয়েট উৎপন্ন করে যা লালা গ্রন্থিতে আশ্রয় নেয়। অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই মশা সাধারণ ম্যালেরিয়া ও ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। এছাড়া এনকেফেলাইটিস, ডেঙ্গু জ্বর, ফাইলেরিয়া রোগের জীবাণুও অন্যান্য মশা বহন করে।

এর পর ২ পাতায়

পাখিদের কথা

পত্রিকার 'পাখিদের কথা'র প্রথম সংখ্যার বসন্তবৌরিকে এইতো সেদিনও একটা গাছের ডালে বসে থাকতে দেখলাম। বসন্তে ফুলের সমারোহ শেষে গ্রীষ্মে তালচোঁচের দল আনন্দে ওড়াউড়ি করছে তা নিশ্চয় এতক্ষণে নজরে পড়েছে প্রত্যেকের। যখন তখন ঝম্‌ঝম্ রিম্‌ঝিম্ বৃষ্টির এই বর্ষাকালে যারা বাসা বানায় ও ডিমপাড়ে তারা হল ডাহুক, কায়েম, জলপিপি, মাছরাঙা, বাবুই, খঞ্জন ও বিভিন্ন জলের পাখি। এরা মোটামুটি গরমের শেষ ও বর্ষার শুরুতে বাসা বানাতে শুরু করে ও ডিম পাড়ে। বর্ষা ঋতুর এইসব পাখিদের কথা একসঙ্গে একটি সংখ্যায় লেখা যায় না, তাই বাড়ির পাশের পুকুরে যে পাখিটিকে দু-চোখের পাতা মেলে ভালো করে দেখিনা সেই পাখিটির কথা বলব আজ; পাখিটির নাম 'ডাহুক'।

এরপর ৩ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

জন্ডিস বা ন্যাবার চিকিৎসা

বিশ্বাস : ১) জন্ডিস হলে মালা পরলে সেরে যায়। গলায় আঁটোসাটো মন্ত্রপূত মালা পরলে একদিনের মধ্যে মালা বড় হয়ে শরীর থেকে নেমে যাওয়ার সময় শরীরকে রোগমুক্ত করে।

২) মন্ত্রপূত জলে হাত ধুলে শরীর থেকে হলুদ রঙ বেরিয়ে জল হলুদ হয়ে যায় এবং রোগ সেরে যায়।

এরপর ৬ পাতায়

রক্ত দান

'রামের রক্তে বেঁচেছে রহিম
হারুন দিয়েছে যোশেফ কে,
সামান্য দান অসামান্য হয়
রক্ত বাঁচায় প্রাণকে।'

মুন্না স্কুল থেকে ফেরার পথে এক দেওয়ালে এই লেখাটা দেখার পর থেকে তার শিশু মনে নানান প্রশ্ন। রক্ত সে কখনও কখনও দেখেছে বটে। কিন্তু রামের রক্ত রহিম পায়, রক্ত দান, প্রাণ বাঁচায় এই কথাগুলোর কিছু বুঝতে পারছিল না। বাড়িতে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করল, "মা—রামের রক্ত রহিম কি ভাবে পাবে?" হিন্দুদের রক্ত, মুসলিমদের রক্ত তো আলাদা শুনি। মা বললেন, 'ও গুলো ঠিক কথা নয়। মানুষের রক্তের চার রকম ভাগ, তাদের মধ্যে আবার পজেটিভ, নেগেটিভ আছে অর্থাৎ মোট আট রকম। রক্তের মধ্যে ধর্মের কোন ভাগ নেই। দু রকম অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি এদের থাকা আর না থাকা নিয়েই আটটি ভাগ। দুজনের রক্ত একই রকম

এর পর ৩ পাতায়

বন্যা

জল ছাড়া জীব জগৎ অচল। সেইজন্য জলের অপর নাম 'জীবন'। কিন্তু যে জল আমাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে তার মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ অনেক সময় আমাদের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে নদীতে জলস্ফীতি দেখা দেয়। এর ফলে নদীর দুই কূল ছাপিয়ে বা

এরপর ৫ এর পাতায়

ম্যালেরিয়া

১ পাতার পর

ম্যালেরিয়ার রোগ লক্ষণ :-

ম্যালেরিয়া রোগে বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখা যায়। যেমন— **প্রথম দশা :** সময় সীমা ১৫ মি: থেকে ১ ঘন্টা। খুব ঠান্ডা লাগে, কাঁপুনি হয়, দাঁতে দাঁত লেগে যায়, মুখ নীলাভ হয়। কাঁপুনি আস্তে আস্তে থেমে যায়। **দ্বিতীয় দশা :** খুব গরম হয়, চামড়া গরম, মুখে লাল আভা ও শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বাড়ে। তাপমাত্রা ৪০° সেন্টিগ্রেড বা বেশি হতে পারে। মাথাব্যাথা, গলা শুকিয়ে যায়। অস্থিরভাব, ভুল বকতে পারে। ২-৪ ঘন্টা স্থায়ী হয়। **তৃতীয় দশা :** রোগী ভীষণ ঘামতে থাকে। সারা শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বেরোয়। তাপমাত্রা কমতে থাকে। স্বাভাবিকের নিচেও নামতে পারে, ঘুমিয়ে পড়ে, ক্লান্তি আসে। ৬-৮ ঘন্টা স্থায়ী হয়।

চার ধরণের জীবাণুর সংক্রমণে যে চার ধরণের ম্যালেরিয়া হয় সেগুলি হল— **১) প্লাসমোডিয়াম ওভেল ম্যালেরিয়া :** মূলত: দ: আফ্রিকায় দেখা যায়। এই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা খুবই কম। আপনা-আপনি সেরেও যায়। মৃত্যুর সংখ্যা নেই বললেই চলে। **২) প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়া (সাধারণ ম্যালেরিয়া) :** সাধারণত সন্ধ্যেবেলায় জ্বর আসে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দিনের বা রাত্রের একটি নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর আসে। এই ম্যালেরিয়ায় ভুগে লোক সাধারণত মারা যায় না। **৩) প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরিয়ি ম্যালেরিয়া :** জ্বর ৭২ ঘন্টা অন্তর অন্তর আসে। জ্বর এলে বমি ভাব দেখা যায়। আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকায় এই রোগ দেখা যায়। এইরোগে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয়। মারা যাওয়ার ঘটনা খুবই কম। তবে এই রোগে বৃক্কের ক্ষতি হতে পারে। **৪) প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া (ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া) :** সবচেয়ে মারাত্মক। রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে ৮-১৫ দিন লাগে। মাথায় যন্ত্রণা হতে পারে। বমি এমনকি পাতলা পায়খানা হতে পারে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বাড়ে। ফুসফুস আক্রান্ত হয়, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হতে পারে। রক্তাল্পতা দেখা যায়। বারেবারে রক্ত পরীক্ষা করে জীবাণুর গতি প্রকৃতি জানতে হবে এবং জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা করতে হবে।

ভারতে ম্যালেরিয়ার চিত্র :

স্বাধীনতার পরে ভারতে যখন ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী নেওয়া হল তখন সারা ভারতে প্রায় ৮ কোটি মানুষ আক্রান্ত, মারা যাচ্ছে বছরে প্রায় ৮ লাখ। শুধুমাত্র ডিডিটি স্প্রে এবং ক্লোরোকুইন দিয়ে চিকিৎসা করার ফলে অভাবনীয় ফল মিলেছিল। ৫৮ সালের মধ্যে সংখ্যাটি নেমে গেল ২০ লাখে। ৫৮ সালে আরও জোরদার কর্মসূচী নেওয়া হল। ফলে ৬১ সালে সারা দেশে একটিও মৃত্যুর খবর ছিল না, শুধুমাত্র আক্রান্ত ছিল ৫০ হাজার। এরপরেই নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর ব্যয় বরাদ্দ অন্যখাতে খরচ করা হল (নিরাপত্তা)। ৬৫ সালে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১ লাখে দাঁড়াল। ৭৬ সালে আক্রান্তের সংখ্যা হল ৬৪ লাখ, এর মধ্যে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া ৭৫ হাজার। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ১৯৯২ সালে সারা ভারতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তর সংখ্যা ১.৫ কোটি, মৃতের সংখ্যা ছিল ১৯,৩০০। যদিও সরকারীভাবে এই আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম করে দেখান হয়েছে। বেসরকারী সূত্র অনুযায়ী (বিভিন্ন প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি ও ম্যালেরিয়ার ওষুধ বিক্রি তথ্যানুযায়ী), **প:বঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগীর আসল সংখ্যাটি বছরে ১০ লক্ষেরও বেশি।** এরমধ্যে ৪০ শতাংশ ফ্যালসিপেরাম্ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। বছরে কমপক্ষে ১৬০০ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। যদিও সরকারীভাবে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম করে দেখানো হচ্ছে। ফলে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ মূলক কর্মসূচী ঠিকমত নেওয়া যাচ্ছে না।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কিভাবে সম্ভব ?

বিজ্ঞানী রাসেল (Rassell) এর মতে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করার উপায়গুলি হল—

(১) মশারি ব্যবহার করা জরুরী। (২) পরিস্কার জামাকাপড় পরা। (৩) জানালায় মশা নিরোধক জাল ব্যবহার। (৪) জলাভূমি সংস্কার করে মশা জন্মান বন্ধ করা। (৫) মশার লার্ভা নিয়ন্ত্রণ করা। (৬) পূর্ণাঙ্গ মশা ধ্বংস করা। (৭) খোলা নর্দমা বা নালা গুলি সংস্কার করা, যাতে নোংরা জল না জমে। (৮) মাঝে মাঝে জল শুকানো : ড্রেন, ধানক্ষেত বা পুকুরগুলিকে মাঝে মাঝে শুকনো করতে হবে, যাতে মশার লার্ভাগুলি মারা যায়। (৯) জলের উপর ঘাসপাতা জন্মালে পরিস্কার করা। (১০) মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় কেরোসিন দিয়ে স্প্রে করা।

ম্যালেরিয়ার ওষুধ

ক্লোরোকুইন বড়ি (১৫০ মিলিগ্রাম বেস)

ভাইভাক্স ও ফ্যালসিপেরামের একই ডোজ

বয়স	প্রথম দিন	দ্বিতীয় দিন	তৃতীয় দিন
১৪ বছরের বেশি	৪	৪	২
৮ থেকে ১৪ বছর	৩	৩	১.৫
৪ থেকে ৮ বছর	২	২	১
১ থেকে ৪ বছর	১	১	০.৫

(প্রতিদিন একই সময়ে খাবার খেয়ে ওষুধ খেতে হবে)

প্রাইমাকুইন বড়ি (৭.৫ মিলিগ্রাম প্রতি বড়ি) শুধুমাত্র ফ্যালসিপেরামের ক্ষেত্রে

বয়স	সময়	বড়ির সংখ্যা
১৪ বছরের বেশি	প্রথম দিন	৬
৮ থেকে ১৪ বছর	প্রথম দিন	৪
৪ থেকে ৮ বছর	প্রথম দিন	২
১ থেকে ৪ বছর	প্রথম দিন	১

অন্তঃসত্ত্বা এবং যে সব মা বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাঁদের কখনওই প্রাইমাকুইন দেওয়া চলবে না। একই ভাবে ২ বছরের কম বয়সী শিশু এবং যাদের গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ডিহাইড্রেজিনেস-এর (জি সিক্স পি ডি) ঘাটতি রয়েছে তাদেরও প্রাইমাকুইন দেওয়া নিষিদ্ধ। খালি পেটে কখনওই ম্যালেরিয়ার ওষুধ খাবেন না।

(সৌজন্যে ডাঃ অমিতাভ নন্দী)

UNIQUE PATHOLOGY CENTRE
Bagmore, Rani Rashmoni Ghat Road.
রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
ECG করা হয়।

মুখস্ত বিদ্যা নয়। পরীক্ষা হলে ইংরাজী বানিয়ে লিখে উচ্চ নম্বর পান।
ভর্তি চলিতেছে—IX - XII & Degree.
যোগাযোগ - T. PAUL
"কুসুম কুটীর", কাঁচরাপাড়া
পলিটেকনিক বয়েজ স্কুলের দক্ষিণে।
ফোন : ২৫৮৮-০৮২১

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
যে কোন অনুষ্ঠানের
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর.পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

রক্ত দান

১ পাতার পর

হলে তবেই একে অপরকে রক্ত দিতে পারবে। তাই রক্ত দান প্রমাণ করে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, ধর্মভেদ মিথ্যা। রক্তের চারটি ভাগ- এ,বি,এবি,ও। প্রত্যেকটি ভাগের আবার দুটি করে ভাগ রয়েছে - পজেটিভ, নেগেটিভ। এদের আর এইচ (Rh) ফ্যাক্টর বলে)

পৃথিবীতে প্রথম ১৬৬৭ সালে ডাঃ ডেনিস কিছু রোগীর দেহে কচি ভেড়ার রক্ত ঢুকিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। সব রোগীই মারা গিয়েছিলেন। ১৮১৭ সালে রিচার্ড লোয়ার একটি কুকুরের দেহ থেকে অন্য একটি কুকুরের দেহে রক্ত সঞ্চালন করে সফল হন। ১৮১৮ সালে ডাঃ জেমস ব্লান্ডেল একজন মানুষের রক্তে আর একজন মৃত প্রায় রোগীকে বাঁচিয়ে তুললেন। ছোট্ট মুন্নার প্রশ্ন তার মাকে, "তবে মা, এই দানকে কেন অসামান্য বলছে?" মা বলেন, কারণ কোনো কোনো অসুখে বা অপারেশানের সময় শরীর থেকে অনেক রক্ত বেরিয়ে গেলে অথবা রক্তের কোনো অসুখে রক্ত তৈরি বন্ধ হয়ে গেলে, তখন মানুষটাকে বাঁচাতে বাইরে থেকে তার শরীরে রক্ত দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তাই সেই মুহূর্তে এ দান অসামান্য। আচ্ছা মা, **শরীরে রক্ত কেন লাগে?**

রক্তের মধ্যে ৫৫ ভাগ থাকে জলীয় অংশ এবং ৪৫ ভাগ বিভিন্ন কোষ। এই জলীয় অংশটাকে প্লাজমা বলে। প্লাজমার কাজ কোষগুলোকে শরীরের বিভিন্ন অংশে বয়ে নিয়ে যাওয়া। আর ৪৫ ভাগের মধ্যে থাকে লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, অনুচক্রিকা। লোহিত কণিকার কাজ ফুসফুস থেকে অক্সিজেন নিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পৌঁছে দেওয়া। শ্বেত কণিকা হচ্ছে দেহের সৈন্য বাহিনী। এরা বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। রোগ জীবাণুর সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। অনুচক্রিকার কাজ রক্তপাত বন্ধ করা। তাই লাল তরল পদার্থ, 'এই রক্ত' শরীরের একটা প্রয়োজনীয় জিনিস। রক্ত না থাকলে শরীরের এসব কাজগুলো হত না। এই রক্ত প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে গড়ে ৯০ মিলিলিটার থাকে। শরীরে যে পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন তার তুলনায় ছেলেদের প্রতি কিলোগ্রামে ২৬ মিলিলিটার এবং মেয়েদের ১৬ মিলিলিটার রক্ত বেশি থাকে। তাই এই বেশি রক্ত শরীর থেকে বের করে মুমূর্ষু রোগীকে দান করলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। তবে এই রক্ত ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত সব মানুষই দিতে পারে। আর এই রক্ত ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যেই শরীরেই পূরণ হয়ে যায়। এর জন্য দুধ, ডিম, ফল খাবার দরকার হয় না।

মায়ের গর্ভে ভ্রূণ থাকে কুসুম থলিতে। তখন থেকেই শুরু হয় রক্ত তৈরি। এরপর লিভার ও প্লীহাতে ও রক্ত তৈরি হতে থাকে। ভ্রূণের বয়স যখন সাত মাস সেই সময় থেকে শুরু হয় অস্থি-মজ্জায় রক্ত তৈরি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত তৈরির প্রধান জায়গা হয়ে ওঠে অস্থি-মজ্জা। অস্থি-মজ্জায় কোনো অসুখ হলে রক্ত তৈরির কাজ হয় লিভার ও প্লীহাতে।

দূর থেকে মাইকের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। মনে হয় প্রচারের গাড়ী বেরিয়েছে—রক্ত দান করার আহ্বান নিয়ে। কোথায় কখন হবে তা জানাতে। মুন্নার ইচ্ছা করে এগিয়ে যেতে। কিন্তু বয়স তার বাধা। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

মহাদেব মল্লিক, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা
ফোন : ২৬৮৪৫৫৫৪

পাখি : ডাহুক

১ পাতার পর

ডাহুক ঃ বাংলায় এদের নাম ডাহুক বা ডাকপাখি, ইংরাজীতে এদের নাম White breasted water hen, এবং বিজ্ঞান সম্মত নাম *Amaurornis phoenicurus*। এরা আকারে গোলা পায়রার মতো। শ্যাওলা-হলদে রঙের ঠোঁটটি পায়রার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণের বেশি লম্বা, তবে নাসারন্ধ্রের উপর লাল ছোপ রয়েছে। মাথার উপরিভাগ থেকে পিঠের উপরিভাগ ও লেজের উপরিভাগের রঙ ফিকে কালো আর কপাল, গলা, বুক ও পেটের রঙ সাদা। লেজের নিচের পালকের রঙ গাঢ় কফির মতো। লেজটি বেশিরভাগ সময় তুলে রাখে তাই লেজের গাঢ় কফি রঙ স্পষ্টভাবে চোখে ধরা পড়ে। হলদেটে পা দুটি অস্থিসার ও আঙুলগুলো বেশ লম্বা লম্বা। স্ত্রী ও পুরুষ পাখি একই রঙের হয়।

এরা জলাভূমি অঞ্চলের পাখি। পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলের সব জলাশয়ে এদের দেখা মেলে। মূলত: যে সব জলাশয়ে বড় বড় কচুরীপানা, কচুবন আছে বা পাশে ঘন বাঁশঝাড় আছে সে সব জায়গায় এদের দেখা পাওয়া যাবে তা আশা করা যায়।

Rails গোষ্ঠীর এই ডাহুকের স্বভাব খুবই ভীরু গোছের; সন্দেহের কারণ থাকলে এরা এক দৌড়ে লুকিয়ে পড়ে অথবা ঝট্‌পট্ ডানা ঝাপ্‌টিয়ে বেশ কিছুটা দূর উড়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। তবে গ্রাম্য এলাকায় বাড়ির চারপাশে, বেড়ার ধারে ও বাগানে এদের স্বচ্ছন্দ ঘোরাঘুরিও চোখে পড়ে। এরা প্রধানত: জোড়া বা দলগত ভাবে চলাফেরা করে। আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টির জলে যখন খানা খন্দ, পুকুর ডোবাগুলি ভরে ওঠে তখন পাশের ঝোপ ঝাড়ের আড়াল থেকে দিনরাত এদের ডাক শোনা যায়। এরা জলাশয়ের জলজ পোকা, শাক-সব্‌জী ও পাড়ের ঝোপঝাড় থেকে বিভিন্ন রকম বীজ, কীট-পতঙ্গ, পোকামাকড় খেয়ে দিন কাটায়।

বর্ষায় পুরুষ ডাহুক পাখি বেজায় ঝগড়া প্রিয় হয়ে ওঠে। এইসময় একে অপরকে তাড়া করে বেড়ায়। মাঝে মধ্যে জলার ধারের বাঁশবনে বা ঝোপঝাড়ের মাথায় উঠে গলা ফুলিয়ে, হাঁ করে বেজায় রকমের ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। ডাক অনেকটা ক্রের্‌র্‌র্ কোয়াক্ কোয়াক্ ধরনের; এর পরপরই কুঁক কুঁক শব্দ করে একটানা অনেক্ষণ ডাকতে থাকে। অনেকসময় গভীর রাতেও এদের ডাক শোনা যায়। এরকম ডাকের জন্যই এদের নাম হয়েছে ডাহুক বা ডাক্ পাখি। এরা জলার ধারের বাঁশঝাড় বা ঝোপঝাড়ের এক-দুই মিটার উঁচুতে অথবা কচুরীপানা-কচুবনের ঝোপের তলায় লতা-পাতা, কাঠিকুঠি দিয়ে অগোছালোভাবে বাটির মত বাসা বানায় এবং তাতে স্ত্রী ডাহুক লালচে বাদামী ছিটে যুক্ত ফিকে হলুদ বা গোলাপী সাদা রঙের ৬/৭টি ডিম পাড়ে। স্ত্রী-পুরুষ দুটি ডাহুকই ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। এভাবেই জলাশয় পাখির কলরবে ভরে ওঠে। জলাভূমির ইকোসিস্টেম রক্ষায় এদের বিশেষ ভূমিকা আছে।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়,
ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা।

সাক্ষাৎকার : বিষয় ম্যালেরিয়া

অধ্যাপক অমিতাভ নন্দী বিভাগীয় প্রধান, প্রোটো জুলজি বিভাগ; স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন; ভারতে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) দ্বারা নির্বাচিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। ম্যালেরিয়া সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে জয়দেব দে, সুরজিৎ দাস, পম্পা দাস। এখানে সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হল।

প্র :- ম্যালেরিয়া রোগটি কিভাবে ছড়ায়?

ডাঃ নন্দী : বাহক স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। কোনো ম্যালেরিয়া রোগীকে এই মশা কামড়ালে রোগীর রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার পেটে যায়। ৫-১২ দিনের মধ্যে জীবাণু মশার পেটে বংশবিস্তার করে এবং শেষে মশার লালা গ্রন্থিতে বাসা বাঁধে। এখন এই মশা সুস্থ মানুষকে কামড়ালে তার দেহে এই জীবাণু প্রবেশ করে, এইভাবে ম্যালেরিয়া ছড়ায়।

প্র :- আর অন্য কোনভাবে ম্যালেরিয়া ছড়াতে পারে কি?

ডাঃ নন্দী : পারে, আগে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে মূল পদ্ধতি। এছাড়া, রক্ত দানের মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। একে বলা হয় ট্রান্সমিশন ম্যালেরিয়া। গর্ভবতী মহিলার ম্যালেরিয়া হলে গর্ভস্থ সন্তানের ম্যালেরিয়া হতে পারে। একে কনজেনিটাল ম্যালেরিয়া বলে।

প্র :- ম্যালেরিয়া রোগটি কিভাবে বোঝা যায়?

ডাঃ নন্দী : ক্লিনিকাল এগ্‌জামিনেশন বা রোগীকে চোখে দেখে ম্যালেরিয়া বোঝা যায়। রক্ত পরীক্ষা করে এব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। ম্যালেরিয়ার লক্ষণ যেহেতু অন্য রোগের লক্ষণের সাথে মেলে তাই এখন ভারত সরকার থেকেও বলা হয় যে কোন জ্বর ম্যালেরিয়া হতে পারে। প্রথম সন্দেহ করা উচিত ম্যালেরিয়া। জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।

প্র :- ম্যালেরিয়ার লক্ষণ কি?

ডাঃ নন্দী : ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলো হল— জ্বর, কাঁপুনি হতে পারে আবার নাও হতে পারে; সাধারণত মাথা ব্যথা করে, বমি বমি ভাব থাকে। লক্ষণগুলো এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে আমরা বলি সাধারণ ম্যালেরিয়া।

প্র :- আপনি বললেন সাধারণ ম্যালেরিয়া। তাহলে কি অন্য ধরণের ম্যালেরিয়াও আছে? থাকলে তা কিভাবে হয়?

ডাঃ নন্দী : সাধারণত ম্যালেরিয়ার রোগীকে দীর্ঘদিন বিনা চিকিৎসায় রাখা হয় এবং আক্রমণকারী জীবাণু যদি ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণু হয় তবে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার ১৫-১৬টি লক্ষণ আছে। এর মধ্যে যেকোন একটি লক্ষণ দেখা গেলে রোগটিকে তখন জটিল ম্যালেরিয়া বলে। এই অবস্থায় দেরী করা হলে রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর অন্যতম কারণ এই দেরী করা।

প্র :- দেরী হওয়ার কারণ কি?

ডাঃ নন্দী : দেরী হওয়ার অনেক কারণ আছে। যেমন—মানুষের অজ্ঞতা। জ্বর হলেই মানুষ সাধারণত গুরুত্ব দেন না। ওষুধের দোকানে বলে জ্বরের ওষুধ খান। দোকানদারেরাও দায়ী। তাঁরাও ভাবনা চিন্তা করেন না। কেউ প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ চাইলেই দিয়ে দেন। এইভাবে ওষুধ খেয়ে জ্বর না কমলে ডাক্তারের কাছে মানুষ আসেন। অনেক সময় এক্ষেত্রে দেরী হয়ে যায়। রোগ জটিল অবস্থায় পৌঁছে যায়। সামাজিক পরিকাঠামোও দেরীর জন্য দায়ী। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া আসার খরচ বা চিকিৎসার অন্যান্য খরচ রোগীর নিকট আত্মীয়র পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব হয় না। ফলে দেরী হয়। আমাদের, চিকিৎসকদের মধ্যেও অনেকেরই অজ্ঞতা রয়েছে। আমরা অনেক সময় ভাইরাল জ্বরের চিকিৎসা করি। ফলে দেরী হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে ম্যালেরিয়া প্রাণঘাতী রোগ। এক মিনিট দেরী হওয়ার অর্থ এক মাইল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

প্র :- জটিল ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলি কি কি?

ডাঃ নন্দী : জটিল ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলি হল— জন্ডিস বা ন্যাবা হওয়া, হলুদ বা কালচে প্রস্রাব, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া, নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হওয়া, ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া, মাড়ি থেকে বা চোখ থেকে রক্ত বের হওয়া। প্রস্রাব ও পায়খানার সাথে রক্ত বের হওয়া, রক্তচাপ কমে যাওয়া, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

প্র :- এই অবস্থায় কি করা উচিত?

ডাঃ নন্দী : রোগী এই অবস্থায় পৌঁছে গেলে তাকে অবশ্যই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বাড়ীতে চিকিৎসা করা চলবে না।

প্র :- রোগীর জটিল অবস্থায় যাওয়া আটকানো যায় কি?

ডাঃ নন্দী : জ্বর হলেই ম্যালেরিয়ার রক্ত পরীক্ষা করা দরকার। সরকার থেকেও এই ব্যাপারে বারবার প্রচার করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা করলে জটিল ম্যালেরিয়া আটকানো যায় এবং মৃত্যু আটকানো যায়।

প্র :- কিছুদিন আগে আমরা জেনেছিলাম ম্যালেরিয়ার জীবাণুর জিন পাল্টেযাচ্ছে। এই বিষয়ে আপনার মতামত কি?

ডাঃ নন্দী : জগৎটাই পরিবর্তনশীল। বিবর্তন একটা স্বাভাবিক নিয়ম। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারলে কেউ বাঁচবে না। সেই নিয়মেই ম্যালেরিয়ার জীবাণুর জিন পাল্টাচ্ছে।

প্র :- এই বদল কিভাবে ঘটছে?

ডাঃ নন্দী : একটা জিন পাল্টাতে গেলে সময় লাগে। এই পরিবর্তন হয় একটা চাপের মধ্যে। প্রত্যেক প্রাণীর বসবাসের জন্য শান্তিময় পরিবেশ চাই। ম্যালেরিয়ার জীবাণুর ধর্ম হল মানুষের শরীরে ঢুকে বংশবিস্তার করা। মানুষের রক্ত হল তার ঘরবাড়ী। তার বসবাসের শান্তিময় পরিবেশ নষ্ট করে ওষুধ। জীবাণু নিজেকে বাঁচানোর জন্য এই ওষুধের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ওষুধগুলো জীবাণুর Metabolic Pathway বন্ধ করে দেয়, ফলে জীবাণু মারা যায়। এই অবস্থায় তারা জিনের বদল ঘটিয়ে নতুন রাস্তা বা alternative pathway তৈরি করে বেঁচে থাকে। ফলে আগের ওষুধে কাজ হয় না, নতুন ওষুধ দিতে হয়। এইভাবে বারবার জিন বদলে জীবাণু বহু ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাধারণত ১০০-১৫০ বছর লাগে, কিন্তু অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহার করার ফলে জীবাণুর উপরে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং জিনের বদল ত্বরান্বিত হচ্ছে।

প্র :- তাহলে কি চিকিৎসা পদ্ধতি পাল্টাবে?

ডাঃ নন্দী : নিশ্চয়ই পাল্টাবে।

প্র :- জাতীয় ম্যালেরিয়া দূরীকরণ প্রকল্প (NMEP) কি বন্ধ হয়ে গেছে?

এরপর ৫ পাতায়

সাক্ষাৎকার

৪ পাতার পর

ডাঃ নন্দী : না, বন্ধ হয়নি। তবে নাম বদলে গেছে, বর্তমানে এর নাম NAMP (National Anti Malaria Programme).

প্র :- বর্তমানে School of Tropical Medicine (STM) এ বা অন্যান্য জায়গায় ম্যালেরিয়া নিয়ে কি ধরণের গবেষণা হচ্ছে ?

ডাঃ নন্দী : বর্তমানে STM সহ ভারতের বিভিন্ন অংশে ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। ম্যালেরিয়া কোথায় কেমন হচ্ছে, তার চরিত্র কেমন, কখন হয়, ম্যালেরিয়ার বহি:প্রকাশ, কোন বয়সের মানুষের বেশি হচ্ছে, কি করে রোগ ছড়াচ্ছে ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। কোন ওষুধ কতটা পরিমাণ কার্যকরী, জীবাণু তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে কিনা তা নিয়ে গবেষণা চলছে। জীবাণুর কোন জিন কতটা দায়ী, জিনের মাধ্যমে জীবাণুর আসল Identity নির্ণয় করার কাজ চলছে।

প্র :- ম্যালেরিয়া দূরীকরণে আপনার মতামত কি ?

ডাঃ নন্দী : ভারত সরকারের ম্যালেরিয়া বিভাগের বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসাবে আমি আমার নির্দিষ্ট মতামত জানিয়েছি, আমার বেশকিছু পরামর্শ সরকারের Policy -তে গৃহীত হয়েছে। বেশ কিছু ব্যাপারে আমাদের দ্বিধা আমরা কাটিয়ে উঠেছি। বাধা অনেক, রাস্তাও দীর্ঘ, তবে আমার মনে হয় অনেকটা বাধা আমরা অতিক্রম করে এসেছি।

অনুলিখন— সুরজিৎ দাস।

বন্যা

১ পাতার পর

নদীর পাড় ভেঙে নিকটবর্তী বসতি, রাস্তাঘাট, কৃষিক্ষেত্র প্লাবিত করে বা ডুবিয়ে দেয়। এই অবস্থাকেই আমরা বন্যা বা প্লাবন বলি।

আমাদের আশেপাশে অসংখ্য নদী নালা ছড়িয়ে রয়েছে। এখন বর্ষাকাল এসে যাওয়ায় নদীর নিকটবর্তী অধিবাসীদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। কারণ, যে কোন সময়ে অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে বন্যার সৃষ্টি হলে তাদের ঘরবাড়ী, কৃষিজ ফসল, গবাদি পশু, অন্যান্য সম্পদ নষ্ট হতে পারে ও জীবনহানি হতে পারে। কিন্তু এই বন্যা কেবল মাত্র অতিরিক্ত বর্ষণের ফলেই হয় না, তুবার জলে পুষ্ট নদীতে তুষারগলা জলের প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে বা জোয়ার জলে পুষ্ট নদীতে জোয়ারের সময় জলস্ফীতি দেখা দিলে বন্যার সৃষ্টি হতে পারে। আবার পার্বত্য অঞ্চলে ধ্বসের ফলে নদীর গতি রুদ্ধ হয়ে গেলে বন্যার সৃষ্টি হতে পারে। অনেক সময় নদীতে জলের প্রবাহ দীর্ঘদিন ধরে হ্রাস পেলে নদীগর্ভে পলি জমে নদীর গভীরতাকে কমিয়ে দেয়। ফলে বর্ষার অতিরিক্ত জল নদীর দুইকূল ছাপিয়ে প্লাবনের সৃষ্টি করে। প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা বন্যা সৃষ্টির কারণ হলেও অনেক সময় মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপই বন্যা সৃষ্টির জন্য মুখ্যত: দায়ী থাকে। যেমন—

১) বনভূমি ধ্বংস : সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ তার প্রয়োজনে নির্বিচারে বনভূমিকে ধ্বংস করেছে। কখনও বনভূমির কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেছে, কখনও আসবাবপত্র তৈরি, বাড়ী-ঘর তৈরি, সেতু নির্মাণ বা জলাধার নির্মাণ করেছে। এর ফলে নদী অববাহিকা অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নদীগর্ভে পলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের জলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে সামান্য বেশি বৃষ্টিতেই নদীতে বন্যা দেখা দিচ্ছে।

২) নিকাশী ব্যবস্থার ত্রুটি : নিকাশী ব্যবস্থার ত্রুটি বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বৃষ্টির জল ভূমির ঢাল অনুসারে উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গার দিকে গড়িয়ে গিয়ে ছোট ছোট নালার সৃষ্টি করে, পরে সেগুলি বড় নালায় পরিণত হয়ে নদীতে মেশে। কিন্তু এই জল নিকাশী নালাগুলির গুরুত্ব অনুধাবন না করতে পারায় এগুলি মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ঐ জায়গায় জল জমে বন্যার সৃষ্টি করছে।

৩) অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন : জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ বিভিন্ন স্থানে তাদের বসতির বিস্তার করছে। কিন্তু অনেক সময় এই বসতি এমন স্থানে গড়ে উঠছে যেটি নিচু জায়গা। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই সেখানে জল জমে বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার বসতি বিস্তারের ফলে অনেক সময় জল নিকাশী ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করছে এবং এর ফলে ঐ অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

৪) নদীতে বাঁধ নির্মাণ ও জলাধার স্থাপন : কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রভৃতির জন্য অনেক সময় নদীতে বড় বড় বাঁধ নির্মাণ ও জলাধার স্থাপন করা হয়। এর ফলে নদীতে স্বাভাবিক জলপ্রবাহ বিঘ্নিত হওয়ায় নদীগর্ভে পলি জমতে থাকে এবং বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া জলাধারগুলিও ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ না করায় তাতে পলি জমে তাদের জলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে অতিরিক্ত জল উপচে গিয়ে বন্যা ঘটায়।

এরপর ৬ এর পাতায়

'পৃথিবীর ছাতা' রক্ষা করার চেষ্টা চলছে

আগের সংখ্যাগুলিতে বলেছি ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, যে গ্যাসটিকে এক সময় মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে মহান আবিষ্কার স্বরূপ দেখা হয়েছিল, তা কিভাবে পৃথিবীর ছাতা অর্থাৎ ওজন স্তরের ক্ষতি করছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১৯৬৯ সালের তুলনায় ১৯৮৭ সালে উত্তর-গোলার্ধে ওজনের পরিমাণ ৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং তার ফলে ৩ X ৬ অর্থাৎ ১৮ শতাংশ ক্যান্সার হওয়ার পরিমাণ বেড়ে গেছে।

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে ১৯৮৭ সালে কানাডার মন্ট্রিয়লে ৩৪টি দেশ একটি চুক্তিতে সই করে জানায় যে তারা ২০০০ সাল নাগাদ সি.এফ. সি (ক্লোরোফ্লুরোকার্বন)-র ব্যবহার ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনবে। কারণ সি.এফ.সি. চূড়ান্তভাবে ভেঙে যেতে প্রায় ১০০ বছর সময় লাগে। যে কোম্পানীগুলো সি.এফ.সি. তৈরী করছিল তারা বিকল্প রাসায়নিক পদার্থ তৈরির ওপর কাজ করতে শুরু করল। কিন্তু এরপর দেখা গেল যে ওজন স্তর আগের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুততার সঙ্গে নষ্ট হচ্ছে। তাই উন্নত দেশগুলি মন্ট্রিয়ল সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে সংশোধন করে ১৯৯০ এর লণ্ডন সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নিল যে ২০০০ সাল নাগাদ তারা ১০০ শতাংশ সি.এফ.সি.- এর ব্যবহার বন্ধ করবে, যা বলবৎ হয়েছিল ১৯৯২ এর ১০ আগস্ট থেকে।

বর্তমানে সি.এফ.সি-এর বিকল্প রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কারও হয়ে গেছে। এই পদার্থগুলি ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানীদের ছাড়পত্রও পাওয়া গেছে। পদার্থগুলি হল— $CHClF_2$, CH_3CClF_2 এবং CH_3CHF_2 এই রাসায়নিক পদার্থগুলি দ্বারা ওজন স্তর কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পদার্থগুলি বায়ুমন্ডলের দ্বিতীয়স্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছানোর আগেই প্রথম স্তর ট্রোপোস্ফিয়ারে ভেঙে যায়।

এই ভাবেই পৃথিবীর পরিবেশকে রক্ষা করে জীবকুলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

— কল্যাণ হালদার।
শিক্ষক ,পলাশী এ.ডি.পি হাই স্কুল।

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

১ পাতার পর

বিজ্ঞান : ১) জন্ডিসের মালা তৈরি হয় বামুনহাটি গাছের ফাঁপা শিকড় দিয়ে। কচি শিকড় মোটা থাকে। শিকড়ের টুকরো গুলোতে এমনভাবে সুতোর ফাঁস দেওয়া থাকে, যাতে শিকড় শুকিয়ে সরু হওয়ার সাথে সাথে ফাঁস ছোট হতে থাকে, মালা বাড়তে থাকে।

২) মন্ত্রপূত জলে প্রথম থেকেই চুন জল মেশানো থাকে। মুখে দিলে চুন জলের স্বাদ বোঝা যায়। ওঝা বা গুণিন আগে থেকেই তার নিজের হাতে আমছালের রস মেখে রাখেন যা খালি চোখে বোঝা যায় না। চুনজল ডোবানো রুগীর হাত থেকে রঙ টেনে নেওয়ার অছিলায় হাত ঘসতে থাকেন। আমছালের রস চুনজলের সঙ্গে মিশে জলের রঙ হলুদ হয়।

জন্ডিস হওয়ার সঠিক কারণ জানা থাকলে আমরা এইসব প্রতারকদের কথায় ভুলব না। রক্তে বিলিরুবিন নামক রঙ্গক (পিত্তে থাকে) পরিমাণে বেড়ে গেলে শরীরের বিভিন্ন অংশে জমা হতে থাকে এবং শরীর হলুদ হতে থাকে। রক্তে বিলিরুবিন বাড়তে পারে যকৃত বা লিভার (আমরা অনেকে একে মেটে বলি) স্বাভাবিক ভাবে কাজ না করলে। শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতার ফলে প্রায় ১ সপ্তাহের মধ্যেই ন্যাবা বা জন্ডিস সেরে যায়। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে চললে এবং সঠিক পথ্য (ভাত, সিদ্ধ ডাল, সব্জি, তেল- ঘি ছাড়া খাবার) নিলে জন্ডিস তাড়াতাড়ি সারে।

— **সুজয় বিশ্বাস।**

বন্যা

৫ পাতার পর

৫) জলাধার থেকে জল ছাড়া : জলসেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীতে যে জলাধার সৃষ্টি করা হয় সেগুলিতে বর্ষার জল আটকে রাখার কথা। কিন্তু জলাধারগুলিতে পলি জমে তাদের জলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় বর্ষার অতিরিক্ত জল জলাধারে আটকে রাখা যায় না। জলাধারগুলিকে রক্ষা করার তাগিদে জলাধার থেকে প্রচুর জল বর্ষাকালেই ছেড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে বর্ষার জল ও জলাধারের জল একত্রিত হয়ে বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

৬) অপরিকল্পিত ভেড়ি ,ইটভাটা স্থাপন ও নদী থেকে বালি তোলা : নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অপরিকল্পিতভাবে মাছ চাষের ভেড়ি ও ইটভাটা গড়ে উঠেছে। এর ফলে জল নিকাশী ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া ইটভাটার জন্য বা বাড়ী তৈরি বা অন্য কারণে নদীগর্ভ থেকে যে পলি বা বালি তোলা হয় তাও অনেক সময়ে নদীর পাড় ভাঙ্গনের কারণ হয়।

বন্যা ও ভাঙ্গনকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে—

১) বনভূমির সৃষ্টি করতে হবে। যাতে বনভূমি ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করে নদীর গভীরতা বজায় রাখবে।

২) ছোট বড় যে সকল নালা জল নিকাশী ব্যবস্থায় যুক্ত সেগুলি যাতে মজে না যায় বা বন্ধ না হয়ে যায় সেই দিকে নজর রাখতে হবে।

৩) পরিকল্পিত ভাবে উঁচু স্থানে বসতি স্থাপন করতে হবে যাতে অল্প বৃষ্টিতেই সেখানে জল জমতে না পারে। আবার বসতি স্থাপনের ফলে যাতে জল নিকাশী ব্যবস্থায় কোন বাধা সৃষ্টি না হয় সেটিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪) অপরিকল্পিত বাঁধ ও জলাধার তৈরি বন্ধ করে স্বাভাবিক জলধারা বজায় রেখে নদীতে পলি জমা বন্ধ করতে হবে।

৫) জলাধারগুলির পলি অপসারণ করে তাদের জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সাথে সাথে জলাধারগুলি থেকে পরিকল্পিত ভাবে জল ছাড়তে হবে। অর্থাৎ বর্ষার আগেই শুখা মরসুমে জলাধারের অধিকাংশ জল ছেড়ে দিয়ে জলাধারকে হাল্কা রাখতে হবে। আবহাওয়া দপ্তর এবং সেচ দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে হবে যাতে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বিবেচনা করে সেচ ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া যায়।

৬) নদীর বাঁধগুলি যাতে বর্ষার অতিরিক্ত জল ধারণ করে রাখতে পারে তার জন্য সারা বছর ধরে নদীর বাঁধের মেরামতি করতে হবে।

সবশেষে আমাদের সচেতন হতে হবে। বন্যা সৃষ্টিকারী যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতে হবে।

— সলিল শেঠ।

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

(এই বিভাগে নিয়মিত ভাবে থাকবে লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের কথা)

মানুষের লোভ অনেক জীবকে পৃথিবী থেকে মুছে দিয়েছে। অনেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। কস্তুরী মৃগ এদের মধ্যে অন্যতম। হরিণের দলে এরা খুবই প্রাচীন। এদের মাথায় কোন শিং নেই। ছোট আকারের এই হরিণটিকে দেখতে পাওয়া যায় উত্তর ভারতের কাশ্মীর থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত অঞ্চলে হিমালয়ের পাদদেশে।

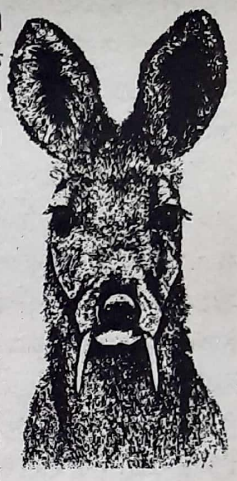

এর বিজ্ঞান সম্মত নাম *Moschus moschiferus.* এই হরিণের উচ্চতা প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার এবং ওজন ৭-১৭ কিলোগ্রাম। দেহের তুলনায় মাথা খুবই ছোট। দেহের সামনের অংশ সরু, দূর্বল এবং পিছনের অংশের তুলনায় নিচু। লেজটি দেহের পিছনের অংশের লম্বা লোমে সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে, বাইরে থেকে দেখা যায় না। কান দুটো বড় এবং গোলাকার। দেহ বাদামী বা লালচে সোনালি ঘন লোম দিয়ে ঢাকা। পায়ের খুর বরফে ঢাকা, পিচ্ছিল, পাথুরে জমিতে চলাফেরার উপযুক্ত। পুরুষ কস্তুরী হরিণের মুখের উপরের চোয়ালের ছেদক দাঁত বড় হয়ে মুখের বাইরে বেরিয়ে থাকে। পুরুষ হরিণের পেটের দিকে চামড়ার নিচে নাভির কাছে একটি গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থিটিকে কস্তুরী গ্রন্থি বলে। গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত কস্তুরীর গন্ধ খুব তীব্র। এই কস্তুরী গ্রন্থির জন্যই এদের হত্যা করা হয়। কারণ কস্তুরীর দাম প্রায় সোনার সমান। পুরুষ কস্তুরী হরিণ একা থাকে এবং কস্তুরীর গন্ধ দিয়ে এলাকা চিহ্নিত করে। স্ত্রী কস্তুরী হরিণ বাচ্চা হরিণদের নিয়ে দল তৈরি করে থাকে। এরা নির্দিষ্ট পথে চলাফেরা করে ফলে এদের শিকার করা সহজ হয়। এরা ঘাস, গাছপালা, মস্, লাইকেন ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। দিনের বেলায় এরা কম চলাফেরা করে। বিপদ দেখলে এরা পরপর কয়েকটা লাফ দিয়ে ঝোপ জঙ্গলে বা পাথরের আড়ালে লুকোয়। এছাড়া এই নিরীহ প্রাণীটি অন্যভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

কস্তুরী দিয়ে প্রধানত সুগন্ধী দ্রব্য তৈরি হয়। আমাদের প্রত্যেক দিনের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এই সুগন্ধের ব্যবহার জরুরী নয়। আমরা কস্তুরী মেশান সুগন্ধী ব্যবহার বন্ধ করে হরিণ বংশের এই প্রাচীন সদস্যকে বাঁচতে সাহায্য করতে পারি। না হলে আরো একটি প্রজাতি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে।

সংখ্যায় কত মজা !

গত মে-জুন সংখ্যায় আলোচিত বক্তব্য দুটির সাধারণ প্রমাণ General proof) দেওয়াই এবারের লেখার উদ্দেশ্য; তাই কোন ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি বক্তব্যে প্রবেশ করছি।

প্রথম বক্তব্যের সাধারণ রূপ :-

প্রথম nটি ধনাত্মক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টি,

অর্থাৎ, 1+3+5+.....n -তম পদ পর্যন্ত = n^2 -এটি প্রমাণ করতে হবে।

প্রথমে আমরা একাদশ শ্রেণীর গণিতের সমান্তর প্রগতির/শ্রেণীর অধ্যায়ের সূত্র ধরে বলব যে, 1+3+5+.....শ্রেণীটি সমান্তর শ্রেণী যার প্রথম পদ a=1 সাধারণ অন্তর d = 3-1 =2

সুতরাং, 1+3+5+..... n তম পদ পর্যন্ত = $^n/_2$ { 2a + (n-1) d}= $^n/_2$ { 2+ (n-1) 2} = $^n/_2$ { 2+2n-2} = $^n/_2$ (2n)= n^2, যেটি উপরের বক্তব্যকে প্রমাণ করে।

যদি উপরের সূত্রটি জানা না থাকে তবে নিচের প্রমাণটি লক্ষ্য করতে হবে।

1+3+5+.... শ্রেণীর n তম পদ = (2n-1)

[লক্ষ্য করতে হবে প্রথম পদ = 2x1-1 =1, দ্বিতীয় পদ = 2x2-1 = 3 ইত্যাদি]

ধরি, S = 1+3+5+..... n তম পদ পর্যন্ত

অর্থাৎ S = 1+3+5+.....+ (2n-5) + (2n-3) + (2n-1) – 1.....(1)

আবার S = (2n-1)+(2n-3)+(2n-5) +.....+5+3+1..... (2) (উল্টে লিখে পাই)

সম্পর্ক 1 ও 2 যোগ করে পাই, 2S = 2n+2n+2n+.....n তম পদ পর্যন্ত

সুতরাং 2S = 2n.n সুতরাং S = n^2

অর্থাৎ প্রথম nটি ধনাত্মক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টি = n^2

পূর্বের সংখ্যার বক্তব্যে বলা ছিলো যে, প্রথম থেকে ধনাত্মক বিজোড় সংখ্যাগুলির প্রগতি বিবেচনা করলে, প্রথম পদটি, 1= 1^3, পরবর্তী দুটি পদের সমষ্টি = 3+5=8=2^3, পরবর্তী তিনটি পদের সমষ্টি = 7+9+11=27=3^3 ইত্যাদি।

লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম পদ (এক্ষেত্রে একটিই পদ আছে) = 1=(n^2-n+1); n=1 দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রথম পদ = 3= (n^2-n+1); n=2, তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রথম পদ = 7= (n^2-n+1); n=3

এইভাবে সাধারণ ক্ষেত্রে যখন সমষ্টি হিসাবে n^3 পাবে তখন অনুরূপ (Corresponding) শ্রেণীটির প্রথম পদ হলো (n^2-n+1).

সুতরাং আমাদের দেখাতে হবে যে,

(n^2-n+1) + (n^2-n+1)+2 + (n^2-n+1) +4+.....n তম পদ পর্যন্ত =n^3

বামপক্ষ একটি সমান্তর শ্রেণী যায় প্রথম পদ a= n^2-n+1 ও সাধারণ অন্তর d= 2

সুতরাং, বামপক্ষের শ্রেণীটির n তম পদ পর্যন্তের সমষ্টি = $^n/_2$ { 2a+(n-1)X 2} = $^n/_2$ { 2(n^2-n+1) +2n-2} = $^n/_2$ {2n^2-2n+2+2n-2}= n^3 অর্থাৎ সাধারণ ক্ষেত্রে বক্তব্যটি প্রমাণিত হলো।

—শোভন বসু।
ফোন- ২৪০৫ ১১০৩

কৌতূহল

এই বিভাগে নিয়মিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রশ্ন প্রকাশকের কাছে পাঠাতে পারে। নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। আমরা যথাসম্ভব সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

(ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নগুলি অপরিবর্তিত ভাবে ছাপানো হল)

প্র : নদীর জলের তুলনায় সমুদ্রের জল বেশি নোনা কেন?

—— টুম্পা রায়,অষ্টম শ্রেণী, কাঁপা হাইস্কুল।

উ: সমুদ্রের জলদেশের ক্ষেত্রফল নদীর তলদেশ অপেক্ষা বহুগুণ বেশি। সমুদ্র হচ্ছে পৃথিবীর মূল জল ভান্ডার। স্থলভাগ থেকে সমস্ত প্রকারের জল বিভিন্ন ঢালের মাধ্যমে (বিশেষত: নদীবাহিত জল) সমুদ্রে জমা হয়। এই জলপ্রবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের লবণও সমুদ্রগর্ভে প্রতিনিয়ত জমা হয়। সমুদ্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে যেসব প্রাণী থাকে তাদের মৃত শরীর থেকেও প্রচুর পরিমানে কার্বনেট ও ফসফেট লবণ সমুদ্র জলে দ্রবীভূত হয়। সমুদ্রের তলদেশে প্রচুর পরিমাণে সুপ্ত ও জাগ্রত আগ্নেয়গিরি বর্তমান। এদের মধ্যথেকে লাভা ও তার সাথে বিভিন্ন প্রকারের খনিজ লবণ নির্গত হয়। এইসব কারণের জন্যই সমুদ্রের জল নদীর জলের তুলনায় বেশি লবণাক্ত।

মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় (শিক্ষক), কাঁপা হাইস্কুল।

প্র: সাগরের জল দিন দিন গরম হচ্ছে। এর কারণ কি?

— লক্ষ্মী দাস (সপ্তম শ্রেণী), কাঁচরাপাড়া উদ্বোধনী মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ।

উ: দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট একপ্রকার উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ আমেরিকাসহ আন্টার্টিকা এবং মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরেও বিশেষভাবে জলবায়ুগত পরিবর্তনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাতের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকান পাতের সংঘর্ষের ফলেই এই প্রকার স্রোতের উৎপত্তি বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর নিকট এই সংঘর্ষ ঘটে থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত ভারী হওয়ায় সেটি অপেক্ষাকৃত হালকা আমেরিকান পাতের নিচে প্রবেশ করে এবং উভয়ের এই সংঘর্ষের ফলে সেই অঞ্চলের সমুদ্রের জল উষ্ণ হয়ে থাকে। উত্তরদিকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে ধাবমান এই উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত এল-নিনো নামে পরিচিত। এরই একটি শাখা অনিয়মিতভাবে দক্ষিণ দিকে আন্টার্টিকা অভিমুখে ধাবিত হয় তখন এর নাম লা-নিনা।

অনিন্দ্য চক্রবর্তী (শিক্ষক), শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়।

প্র: পৃথিবীর ভারসাম্য কি অতিরিক্ত যান্ত্রিক সভ্যতার কারণে ধ্বংস হচ্ছে ? পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখতে হলে আমাদের কি করণীয় আছে?

— তন্ময় বেপারী, কাঁচরাপাড়া উদ্বোধনী মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ।

উ: আদিম যুগে প্রকৃতিতে পরিবেশ দূষণ আপনা-আপনিই ঘটত এবং প্রকৃতি নিজেই সেই দূষণ কাটিয়ে উঠত। কিন্তু বর্তমানে মানুষের কাজের ফলে সৃষ্ট দূষণ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নগরী স্থাপন, বনজ সম্পদের নির্মূলীকরণ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, যত্রতত্র কলকারখানা স্থাপন এবং কলকারখানা থেকে নির্গত নানাবিধ শিল্প আবর্জনা, বিষাক্ত ধোঁয়া পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখতে আমাদের করণীয়- মানুষকে সচেতন করা, বৃক্ষরোপণ করা, দূষিত পদার্থগুলি পরিবেশে বর্জন বন্ধ করা, প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করা।

তাপস মজুমদার (শিক্ষক),শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়।

Declaration No. 28/JM dt. 23.6.2003 (From Office of the District Magistrate, North 24 Pgs J.M Department), Barasat. Vide Memo No. 714(4)/ J.M. Dated. 30.6.03.

প্রশ্নোত্তর

২৮.০১.২০০৩ কাঁচরাপাড়া হাইস্ডমার্শ ইন্‌স্টিটিউটে সারাদিন ব্যাপী এক বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ৩৫টি স্কুলের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। এবারের সংখ্যায় জলাভূমি ও বৃক্ষসংরক্ষণ বিষয়ে ৭ টি প্রশ্নের সেরা উত্তর ছাপান হল (সামান্য সংশোধন সহ)

— সম্পাদক, বিজ্ঞান অন্বেষক।

প্রঃ জলাভূমি বলতে কি বোঝ ?

উঃ যেসব জলা, বিল, বাঁওড়, পুকুর, খাল-বিল সামগ্রিকভাবে উৎপাদনমুখী হয়ে পরিবেশকে সর্বদাই পুষ্টি যোগায় এবং ময়লা জল শোধন করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে তাদের জলাভূমি বলে।

মৃন্ময় সরকার; প্রতীক ব্যানার্জী
নিমতলা রঙ্গেশ্বরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

প্রঃ জলাশয় কিভাবে দূষণ কমায়?

উঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি গ্যাস জলাশয়ের জলে মিশে যায়। ফলে বায়ু মন্ডলে এদের পরিমাণ খুব বেশি বৃদ্ধি পায় না। ফলে বায়ু দুষণ অনেক কম হয়।

শেখ মনিনুর ইসলাম; কামরুল গাজী
শালিদহ হাইস্কুল।

প্রঃ জলাশয় সংরক্ষণের ফলে আমরা কিভাবে উপকৃত হই?

উঃ জলাশয় সংরক্ষণের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাজা শাকসবজি পাওয়া যায়। মাছ চাষের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায় ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়। জলাশয় পরিবেশকে নির্মল রাখে।

অনিমেষ ঢালী; লক্ষণ দাস
পানপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠ।

প্রঃ খরা, বন্যার সমস্যা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

উঃ খরা, বন্যা প্রতিরোধ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের যা করণীয় তা হল, গাছ কাটা বন্ধ করা। গাছের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। গাছ কেটে ফেললে মাটি আলগা হয়ে যায় এবং বৃষ্টি হলে এই মাটি নদী-নালা, পুকুরে গিয়ে জমা হয়। এর ফলে নদী, খাল-বিল, ভরাট হয়ে বর্ষাকালে দেখা দেয় বন্যা।

আবার গাছ না থাকার দরুণ পরিবেশ অত্যন্ত শুকনো হয়ে যায়। দেখা দেয় খরা, তাই খরা ও বন্যা আটকানোর জন্য আমাদের অবাধে গাছ কাটা বন্ধ করা দরকার।

রুনু সরকার; পিয়ালী সিকদার
পলাশী আচার্য্য দুর্গাপ্রসন্ন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

প্রঃ জলাশয়ের সঙ্গে জীবজগতের অস্তিত্বের কি সম্পর্ক রয়েছে?

উঃ জলাশয়ের সঙ্গে জীবজগতের অস্তিত্বের সম্পর্ক রয়েছে। জলাভূমি থাকলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। জলাশয় কোনো অঞ্চলের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবেশের ক্ষতিকর পদার্থকে দ্রবীভূত করে।

তাপস সরকার।
হালিশহর মল্লিকবাগ হাইস্কুল।

প্রঃ বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ পরিবেশের কি উপকার করে?

উঃ বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে। বিভিন্ন কাজে মানুষের চাহিদা মেটাতে বনভূমি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বনজ সম্পদ অনেক মানুষের জীবনধারণের সহায়ক হয়।

মৌমিতা বিশ্বাস; রাখী মজুমদার
লাউপলা কল্পতরু হাইস্কুল।

প্রঃ জলাশয় বাঁচাতে ও বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তুমি কি করতে পার?

উঃ জলাশয় বাঁচাতে ও বৃক্ষ সংরক্ষণ করতে আমরা বন্ধুরা দল তৈরি করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষকে জলাশয় ও গাছের গুরুত্ব বোঝাতে পারি। সবাইকে গাছ লাগাতে ও জলাশয় ভরাট না করতে বলতে পারি। আমাদের আশেপাশের গাছকে যত্ন করে বড় করতে পারি।

প্রদীপ সরকার; পারমিতা বসাক
কাষ্ঠডাঙা তারক দাস বিদ্যাপীঠ।

আগের প্রশ্নের আরেকটি উত্তর—

উঃ যেহেতু আমরা এখনও ছাত্রী তাই এব্যাপারে আমাদের ক্ষমতা সীমিত। তবুও রাজ্য সরকারের আইন, সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ পালন করে এবং সমাজকে জলাশয় ও বৃক্ষের সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করে জলাশয় ও গাছপালাকে বাঁচাতে পারি।

চন্দ্রিমা দে; মীনাক্ষী নাথ
বড় জাগুলী রাজলক্ষী কন্যা বিদ্যাপীঠ।

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব বিজ্ঞান দরবার সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত।

সম্পাদক মণ্ডলী—প্রতুলকুমার দাস, দীপক মজুমদার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস ও সুজয় বিশ্বাস (বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে)।

Owner, Published & Printed by Joydev Dey, 585, Ajoy Banerjee Road (Near Binod Nagar P.O.) P.O. Kanchrapara, Dist- North 24 Parganas, PIN- 743145, & Printed at Screen Art, 20 Netaji Subhas path, P.O. Kanchrapara, Dist- North 24 Parganas, PIN- 743145. Editor : Shibprasad Sardar. Phone- 2585-6032,2580-8816,28760720,28460778, 2588-0821.

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগনা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগনা, পিন-৭৪৩১৪৫ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক– শিবপ্রসাদ সরদার।